সত্য বড্ডই নির্মম

ছগীর সাহেবের প্রতি

শেখ মুজিব, শেখ কামাল ও শেখ জামাল এই তিনজন ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর নিহতের ঘটনায় আমি তেমন মাথা ঘামাই না ও তেমন দুঃখ পাই না। তবে বেগম মুজিব, শেখ রাসেল ও তার দুই অন্তঃসত্ত্বা ভাবী দ্বয়ের নারকীয় হত্যাকান্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক তা এজন্যই তারা তো আর কোন অপরাধ করেনি। তবে শেখ মুজিব ও তার দুই বড় ছেলের মৃত্যুতে খুশীর কিছুই নাই। কারণ আমাকেও একদিন মরতেই হবে। যেহেতু আমার মতে মুজিব ভাল ও মহান নেতা হলেও একজন অদক্ষ, দুর্বল দূরদর্শিতার এবং ব্যার্থ প্রশাসক ছিলেন। তার মতন শাসকের মৃত্যুতে দুঃখ বা আফসোস সাময়িক। নেতা মুজিবের কৃত্বি চির অম্লান কিন্তু শাসক মুজিবের কৃত্বি তেমন উজ্জল নয়। মীর মোশারফ হোসেনের মতে ব্যার্থ শাসক যত তাড়াতাড়ি দুর হয় ততই দেশের জন্য মঙ্গল। অসম দিল্লী-মস্কো ব্লক, তলা বিহীন ঝুড়ির দেশ, পাকিস্তান আমলের ১৪ আনা সেড় চাল স্বাধীনতার সাথে সাথে একলাফে ৯ টাকা হওয়াতে দেশের ৯৯% লোকের বিরাগভাজন হন। স্মরণীয় যে সে ১৯৭৫ সময় বাকশাল ছিল। ব্যাস আর যায় কই আমেরিকার সিআইএ তার এজেন্ট খন্দকার মুশতাক কে দিয়ে পুরোপুরি ফায়দা তুলেন। ফলশ্রূতিতে মুজিব, কামাল, জামাল দের পরিণিতি তাদের পুরো পরিবারের জন্য চরম-পরম দূর্ভাগ্যজনক ও ঘৃণ্য পরিণতি ডেকে আনে। তবে ছগীর সাহেব মনে রাখবেন কারবালার ট্র্যাজেডি সমগ্র বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানের জন্য পরম বেদনা দায়ক। তার সাথে ১৫ই আগষ্টের ঘটনার তুলনা করলে বলতেই হয় কই কায়দে আজম আর কই বদহজম। বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের কয়টি মুসলিম দেশে এই ১৫ই আগষ্টের ঘটনা নিয়ে মাতম থাকে? অথচ বিশ্বের তামাম মুসলমাগণ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ) এক বাক্যে তাদের জন্য কাঁদে ও দোয়া করে। যেখানে বাংলাদেশের ৬০% মানুষের কাছে ১৫ই আগষ্টের হত্যাকান্ড কোন আরকি বিন্দুমাত্র শোকের সৃষ্টি করে না(এমন কি বহু আলীগের সমর্থক পর্যন্ত সামান্যতম শোক বোধ করেন না) সেখানে আবেগ আপ্লুত হয়ে কারবালার সাথে তুলনা করা আর বোকার স্বর্গে বাস করা সমান কথা। মনে রাখবেন ১৫ই আগষ্টের হত্যাকান্ড বাকশাল, মুজিববাদ কে জাগ্রত বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি কিন্তু কারাবালার ট্র্যাজেডি ঐ মহান আল্লাহ্‌ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম কে আরও জাগ্রত এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে জন্যেই তো বলে ইসলাম জিন্দা হোতা হে হার কারবালাকে বাদ। কাজেই যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী দয়া করে এ জাতীয় তুলনা দিবেন না। খ্রিষ্টান ও হিন্দুরা যিশু, ভগবান কে যতত্র বিভিন্ন মহান মানুষের সাথে তুলনা করলেও ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্‌, নবী-রসুলগণ তো দুর বরং রসুল(সাঃ) এর জামানার সাহাবাদের সাথে পর্যন্ত তুলনা করা যায়না। এ ছাড়াও জার সম্রাটের সাথে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের(৪ জন), ভৃত্য হত্যাকান্ড, ১৯৬৩ সালে জন,এফ, কেনেডী এবং ১৯৭৩ এ চিলীর প্রেসিডেন্ট আলিয়ান্দ্র হত্যাকান্ড ১৫ই আগষ্টের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর কেনেডীর হত্যাকান্ডের বিচার তো দুর বরং তার হত্যাকান্ডের তদন্তের রিপোর্ট ৭৫ বছরের জন্য ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে যা ২০৩৮ সালের পর বের হবে। চিলির আলিয়ান্দ্রর হত্যা ও যুদ্ধাপরাধের জন্য দ্বায়ী সাবেক জেনারেল অগষ্টা পিনশোটের বিচারের নাটক বৃটেন ২/৩ বছর আগে চেষ্টা করলেও আমেরিকার জন্য তা পারে নি । ৭৫ এর হাতিয়ার যা ১৫ই আগষ্ট কে বুঝায় তাতে নিরীহ মানুষ হত্যায় অরাজক ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হৌক তা চাই না। কিন্তু আমার কাছে ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ এর বিপ্লব চির জাগ্রত যা বাংলাদেশের ৬০% জনগণের কাছেও।

শহীদ জিয়া ১৫ই আগষ্টের নীরব নিরীহ স্বাক্ষী। কারণ শেখ মুজিবের জিগড়ী দোস্ত খন্দকার মোশতাক ছিলেন ঐ সময়ের আমেরিকার পিনশোর মতই ডিক্টেটর। জিয়াউর রহমান নিজেকে দুই জিগড়ী দোস্তের ঝগড়া থেকে বিরত রেখেছেন আর চাইলেও বা তিনি নিজের জীবন দিয়ে হলেও মুজিব ও তার পরিবার কে রক্ষা করতে পারতেন না। যদি জেনারেল শফিউল্লাহ্‌ (বর্তমানে আলীগে আছেন এবং ১৯৯৬ সালে নারায়গঞ্জ হতে আলীগের এমপি

নির্বাচিত) ১৫ই আগষ্টের পর মুশতাক তাকে বিদেশের একটি রাষ্ট্রে বাংলাদশের রাষ্ট্রদুত করতে পারেন তো জিয়াউর রহমান সেনা চীফ হলে এত্ত গত্রদাহ কেন? দেশের ৬০% জনগণ যদি জিয়া-খালেদা ও নিজামী কে যদি সমর্থন করে ও ভালবাসে তো কোন মানুষের সাধ্য আছে তাদের কে রূখার? আর ১৫ই আগষ্টের মূল নায়ক মোশতাক মারা যান ১৯৯৫ সালে। অনেক আওয়ামিলীগার সমর্থক বলে যে সে মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। হাস্যকরই বটে কারণ তার কবরের আজাব চলছে কিনা তা কোন মানুষের পক্ষে নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। আর তারপরও যদি বলা হয় যে সে বেঁচে গেছে তো বলতেই হয় আল্লাহ্ তালাই তাকে বাঁচিয়েছেন কারণ ১৯৯৬ সালেই আলীগ ক্ষমতায় আসে। ইনডেমনিটি বাতিল হয়েছে (নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্সে ১২ জনের মৃত্যুদন্ড বহাল আছে) যা ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর জজ জনাব গোলাম রসুলের রায়ে ১৫ জনের ফায়ারিং স্কোয়াডে অথবা ফাঁসির দন্ডাদেশের রায় হল সাথে সাথেই আওয়ামিলীগাররা মিষ্টি মুখ করতে লাগল অথচ এখন পর্যন্ত রায় কার্যকর হয়নি। গাছে কাঠাল আর গোফে তেল।

শুধু স্বল্প সংখ্যক আসল মুজিব ভক্তই মুজিবের জন্য কাঁদেন যাতে তার দুই মেয়েও আছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশীরভাগই লোক দেখানো কাঁদেন এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে ব্যাপকভাবে তোষামোদকারী ও সুবিধাবাদীরাই কেঁদেছেন লোক দেখানো। যেমন ১৯৮৯ সালে জনাব কাজী জাফর, এরশাদের মা'র মৃত্যুতে এরশাদের চেয়েও বেশী কেঁদেছেন। কাজেই মুজিব হত্যার বদলা ও রাজপথ দাবড়ানোর মত লোক কই? খালি খালি আবেগ অবাস্তব কল্পনা করলেই হবে? ২০০৪ এর ৩০ এপ্রিলের হাসিনার ডেডলাইনের ভেতরই দশ ট্রাক অস্ত্রের চালান ধরা পড়ল অথচ দোষ জোট সরকারের কিন্তু আওয়ামিলীগাররা বলেনা যে এই তথাকিথিত ডেডলাইনের রহস্যটা কি? আবার ২০০৪ এর ভয়াবহ বন্যা যখন জোট সরকার কোন প্রকার বিদেশী সাহায্য ছাড়াই সফল ভাবে মোকাবেলা করছিল ঠিক তখনই ৮/২১ এর নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। যাতে জোট সরকার কে বেকায়দায় ফেলা যায়। আওয়ামিলীগের শেখ হাসিনা সহ ২১ শে আগষ্টের গ্রেনেড হামলার দিনের অন্যান্য নেতারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনে কোন সাক্ষ্য দিলেন না কেন? সামান্য এমনকি কোন কিছু হয়নি তা সত্ত্বেও ডজনের উপর আলীগের বিশিষ্ট নেতারা ভারতে চিকিৎসা নিতে গেলেন যেখানে ভারতীয় ডাক্তাররা পর্যন্ত বলেন যে তারা সুস্হ সবল আছেন এবং ভারতে আসার কোন দরকার ছিল না। মনে রাখবেন দেশের মানুষ অত্ত বোকা নয় যে জোট সরকার কে মিথ্যা দোষ দিয়ে আওয়ামিলীগারদের কথায় তারা জোট সরকারের পতন ঘটাবে। যারা ৮/২১ এর ঘাতক তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশে অরাজক পরিস্হিতি সৃষ্টি করে জোট সরকারের উৎখাত এবং মোটেও শেখ হাসিনা কে হত্যা করা নয়। ১৫ টি গ্রেনেড যার ১১-১২ টিই বিস্ফোরিত হয় কিন্তু রহস্যজনক যে সব বোমাই হাসিনা কে লক্ষ্য করে ছোড়া কিন্তু একটিও ট্রাকে পড়েনি। কিন্তু ঘাতক গ্রেনেড নিক্ষেপকারীরা মোটেও আনাড়ী নয় অন্তত তাদের কাজ তা বলেনা। আনুমানিক চার গ্রুপে ভাগ হয়ে চার কোণ হতে এই কান্ড ঘটালো অথচ একটিও হাসিনা কে বা তার ট্রাকে আঘাত হানল না ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। ওসমানী উদ্যানে ও ঢাকা জেল খানায় গ্রেনেড পাওয়া সেই একই ঘাতক গ্রূপের ও অবশ্যই ভারতীয় "র" এর কাজ যাতে প্রমাণ করা যায় যে জোট সরকার বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের জেলে আটক খুনীদের ভাগিয়ে দিতে চায়। মোদ্য কথা আওয়ামিলীগারদের একটা উসিল্যা দরকার যা তারা ২০০১ এর সংসদ নির্বাচন পরবর্তী ব্যার্থ যা মিথ্যা বহুলাংশে কাল্পনিক সংখ্যা লঘু তথা হিন্দু নির্যাতনের খবর সারাবিশ্বে প্রপাগান্ডা করে কোন লাভ হয়নি।

১৯৯৬ সালের ১২ ই জুনের নির্বাচন কে আওয়ামিলগির-বাকশালী-তাবেদারজীবিরা এক বাক্যে অবাধ-সুষ্ঠ-কারচুপিহীন বা ষড়যন্ত্র মুক্ত বলে দ্বাবী করেন। তো সে হিসেবে আলীগ, বিএনপি, জাপা, জামাতের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণও নিশ্চয়ই সঠিক এই যে আলীগ ৩৮% ও বাকি তিনদল(বিএনপি, জাপা, জামায়ত) মোট ৬২% ভোট পেয়েছে। কিন্তু যেই ২০০১ এ জোট ভোট ৪৭%(আলীগ ৩৯.৯৪%) হয়ে গেল তখন হল সেটা মিথ্যা, কারচুপি

বা ষড়যন্ত্র। তো অন্ধ আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবিরা চাহে সজ্ঞানে বুঝুক বা না বুঝুক যা আলীগের সাধারণ সমর্থক সহ দেশের ৬২% মানুষ ঠিকই বুঝে যে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের মতনই অবাধ ও সুষ্ঠ-স্বচছ ছিল। কিন্তু আওয়ামিলীগারদের অভিধানে ভোটে হার স্বীকার বলে কিছু নাই। কাজেই ছগীর সাহেব হাসিনা কে যতই বুঝান উনার কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই তার সবচেয়ে বড় টার্গেট। আর যেখানে স্বয়ং শেখ হাসিনা ভারতের মূখ্য মন্ত্রী ডাক শুনে আনন্দিত হন বা মনে মনে রাজি হন তো সেখানে তথাকথিত পাকিস্তান পন্হী খালেদা-নিজামীদের কে(তুলনা করে) শুকুন হায়েনা ঘূর ঘুর করবে তা কি মানান সই হয়? ভারত কে টপকে ১২০০ মাইল দুর হতে পাকিস্তান কি করে এ দেশ কে আবার পাকিস্তান বানাবে? যত্তই দুঃখ পান জামাতের সারা বাংলাদেশে ব্যাপক ভোটার আছে। সেই গুরূত্ব আলীগ না বুঝলেও বিএনপি হারে হারে টের পায়। একদিকে সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদ আর অন্যদিকে বিএনপির সম আদর্শের ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আদর্শে বিশ্বাসী এরশাদের জাপার সাথে জোট বাঁধতে আপনারা দিওয়ানা। কিন্তু আপনাদের ভাবখানা এমন যে বাংলাদেশের ১০০% মানুষই আপনাদের সাথে বর্তমানে ১৯৭১ সালের মতন আছে। আরকি বাংলাদেশের ১৪-১৫ কোটি মানুষই আলীগ করে। মনে মনে ব্যাপারটি সঠিক নয় উপলব্ধি করলেও জিন্দেগীতে তা স্বীকার করবেন না। দেশের ৬০-৬২% মানুষ বঙ্গবন্ধু কে জাতির জনক স্বীকার না করলেও আপনারা বলপূর্বক তা চাপিয়ে দিতে চান। কোমড় দিয়ে পর্বত ঠেলতে চান। ঠিক যেমনি উড়ে এসে জুড়ে বসার মতন করে বলেন যে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভট সংস্কার এবং তা না হলে হাসিনা নির্বাচনে যাবে না। মনে রাখবেন বিএনপি-জামাত-জাপা কেউই আলীগের এই উদ্ভট দ্বাবী সমর্থন করে না এবং ১৯৯৬ আর ২০০৬ এক নয় যেখানে আলীগ ছাল নাই কুত্তার বাঘা নামধারী ১৩ দলীয় কমিউনিষ্টদের সাথে নিয়ে জোট সরকারের পতন ঘটাবে এবং ক্ষমতায় যাবে।

অবশ্যই স্বীকার করি ১৯৯৬-২০০১ সালে হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে যা বেগম জিয়া অস্বীকার করেন। এটা অবশ্যই নিন্দনীয় ব্যাপার। পক্ষান্তরে আপনারা বলে বেড়ান যে ১৯৭৬-৯৬ বিশ বা একুশ বছরে বাংলাদেশে কিছুই উন্নয় হয় নি। একজন শহীদ জিয়া যিনি সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের জন্য (যদিও আলীগ মুখে স্বীকার করে না যা দেশের ৬০-৬২% জনগণ মনে প্রাণে স্বীকার করে) মানুষের প্রাণের অস্তিত্ব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা তাকে আপনারা যা মুখে আসে তাই তথা মিথ্যা বলেন(গালাগালি ও মিথ্যা অপবাদ)। তিনি যে সময়ে এস.এস.সি পাশ করেন আমার পিতাও তার সমসাময়িক। আমার পিতা বলেন ১৯৫৫ সালে মাত্র ১৭% মেট্রিক পাশ করেন যেখানে প্রথম বিভাগ একে বারেই দূর্লভ অথচ আজ ৫০ বছর পর ২০০৫ এ ৪৫-৫০% ই মেট্রিক পাশ করে এবং ভুড়ি ভুড়ি এ ও এ+ পায়। তো শহীদ জিয়া সেই সময়েরই ছাত্র এবং এইচ.এস.সি পাশের পর তিনি সম্পূর্ণ নিজ মেধা ও যোগ্যতায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আর্মি তে চান্স পান এবং শুধু তাই নয় বরং তার সেনাবাহিনীর লোক হিসেবে কৃতিত্বের জন্য তিনি পশ্চিম জার্মানি, বৃটেন ও আমেরিকায় বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান সরকারের স্কলারশীপ পান। ঐ সময়ে বাঙালীদের সামরিক সহ বিভিন্ন সরকারী চাকুরিজীবি হয়ে বিদেশে স্কলারশীপ পাওয়া তো দুর বরং চাকুরী-পদন্নতি পাওয়াছিল দুস্কর। কিন্তু ১৯৭২-৭৫ সালে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় খরচে যা আমি বলব অপচয়ে শেখ জামাল বৃটেনে যেয়ে সামরিক ডিগ্রী অর্জনে একবার নয় দু-দুবার ফেল মারেন। রাষ্ট্রীয় টাকা পানিতে গেল কিন্তু শেখ জামাল সামরিক ডিগ্রি অর্জন করতে পারলেন না। অথচ কুলাঙ্গার সাবেক জেনারেল শফিউল্লাহ্ শহীদ জিয়া কে বলেন যে তিনি নাকি থার্ড ক্লাস লোক। এই জিয়াউর রহমানের জন্যই বাংলাদেশের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। কারণ একটাই তার ২৬ শে ও ২৭ মার্চ ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধর চূড়ান্ত ঘোষণা রেডিও তে জিয়ার মুখ দিয়েই উচচারিত হয়। আজকে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় এবং জিয়ার অবদান অস্বীকার করা হয়। আর বলা হয় ২৫শে মার্চ রাতেই নাকি ইপিআর এর ওয়ারলেস দিয়ে আবার রেকর্ডকৃত মেসেজ বলধা গার্ডেন থেকে ট্রান্সমিট করা হয়। তো

পাকি বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে এগুলো কিভাবে সম্ভব? আসল সত্য হল আওয়ামিলীগের চট্টগ্রামের কয়েকজন নেতা এম.এ. হান্নান সহ দু একজন নিজেদের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়া কে দিয়ে দুবার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করান। না বঙ্গবন্ধু না জনাব হান্নান তাদের কেউ ২৫-২৬-২৭ শে মার্চের কোন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর চূড়ান্ত ঘোষণা দেন। তাহলে তাদের সেই ঘোষণা সমূহের বা প্রদত্ত জবানের কোন অডিও রেকর্ড আছে যা আছে মেজর জিয়াউর রহমানের। এমন কি বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে সরাসির শুনে লিখিত মেসেজের প্রমাণ বা দলিল পর্যন্ত নাই। আসলেই তা নেই কারণ প্রকৃত পক্ষে আওয়ামিলীগারদের দ্বাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। যা বাস্তবে ঘটেনি তাকেই গোয়েবেলসীয় কায়দায় সত্য বানানোর প্রাণন্তকর চেষ্টা চলছে ঠিক যেমন বলা হয় বঙ্গবন্ধু নাকি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য জেলখান হতে চিরকুটের মাধ্যমে ছাত্র নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে বর্তমানে উদ্ভট মিথ্যা দ্বাবী করে আওয়ামিলীগাররা। আর স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ব্যাপার ও ১৯৭১ এর ২৫-২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা তিনি তার জীবিত অবস্হায় কোনদিন উল্লেখ করেন নি আর জনাব এম.এ হান্নানের ব্যাপার তো অবান্তর। কিন্তু শহীদ জিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর একবার প্রকাশ্যে বলেন ২৭ শে মার্চের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন । আসল ব্যাপার হল ২৭শে মার্চ যেখান থেকে সরাসরি ঘোষণা দেন তা সরাসরি বাংলাদেশের পার্শ্বের ভারত-বার্মা ছাড়িয়ে আরও বেশ কয়েকটি এশিয়ার দেশে পৌছে ছিল এবং তৎকালীন বিবিসি সহ আন্তজার্তিক মিডিয়ার কাছেও পৌছে ছিল। কিন্তু শহীদ জিয়ার ২৬শে মার্চের অনুল্লেখে বা তার মানে এই নয় যে জিয়া ২৬ শে মার্চ ঘোষণা দেন নি। আসলে ২৬ শে মার্চের কালুর ঘাটের রেডিও ট্রান্সমিশন যন্ত্রের রেঞ্জছিল ১০০-১২০ মাইল যা কেবল ভারতের ত্রিপুরা ও বার্মার পশ্চিমাংশ এবং এমন কি চট্টগ্রামের বাইরে কেবল নোয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা সহ আর দু একটি জেলায় শোনা যায়। যদিও ভারতের ত্রিপুরা ছাড়া আন্তজার্তিক মহলে ২৬ শে মার্চের ঘোষণা পৌছে নাই কিন্তু উক্ত ঘোষণা দ্বারাই সারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট সংবাদ পৌছে যায়। তবে যে সকল আন্তজার্তিক গ্রন্হে, জার্নালের রেফারেন্স দেওয়া আছে মুজিব বা এম.এ হান্নানের স্বাধীনতা ঘোষণা তা আওয়ামি তাবেদারজীবি দের সরবারাহ কৃত। সবচেয়ে বড় কথা ২৫-২৬-২৭ শে মার্চের মুজিব বা হান্নারে ঘোষণার পক্ষে কোন অডিও রেকর্ড সেই সকল আন্তজার্তিক রেফারেন্সে নাই। তবে বিএনপির একটাই অন্যায় যে বঙ্গবন্ধু শব্দটির মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে বাদ দেওয়া। যদিও বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে সশস্ত্র যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সংঘাতের মাধ্যমে স্বাধীনতা চান নি এবং ২৫ শে মার্চে কোন চূড়ান্ত দিক নির্দেশনা দেন নি তথাপি পুরো জাতি তাকেই মহানায়ক মেনে নিয়ে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করে। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কিন্তু মোটেও বাংলাদেশ কে স্বাধীন করতে চান তা স্পষ্ট করে বলেন নি তাতে তোফায়েল আহমেদ, শাজাহান সিরাজ সহ ছাত্র নেতারা তাতে পুরোপুরি খুশী হন নি। বস্তুত ৭-২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সহ পুরো জাতি আশা করেছিল যে হয়তোবা ভুট্টো-ইয়াহিয়া গং মুজিবের প্রধানমন্ত্রীত্ব মেনে নিয়ে উদ্ভুত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করবে। যদি তাই হত তাহলে অত্র অঞ্চলের ইতিহাস ভিন্ন হত। বস্তুত সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বিষয়ে কেউ নিশ্চিত হতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে পাকিবাহিনীর হাতে তিনি এখানকার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন এবং কোনদিনও বিচিছন্নতার দ্বাবী করেন নি কিন্তু দেশের আপামর জনতা হয় স্বায়ত্ব শাসন অথবা স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল এবং পরিস্হিতি ছিল মুজিবের নাগালের বাইরে। কিন্ত বিধিবাম কে জানত পাকিবাহিনী অমন বর্বরোচিত হামলা আরেক মুসলমানদের উপর করবে। সে জন্যেই প্রফেসর ডঃ মাহাবুব উল্লাহ্ বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তহীনতা যৌক্তিকতা দিয়েছিল মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা(সুত্র: "আওয়ামিলীগের উচিত সংসদে এসে কথা বলা", দৈনিক ইনকিলাব ১১/৪/২০০৪ইং)। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আমেরিকার গোপন দলিলে পর্যন্ত লিখিত আছে যে বঙ্গবন্ধু কনফেডারেশন চেয়েছিলেন স্বাধীনতা নয়।

শেখ হাসিনার কাছে কি অমন আলাউদ্দিনের চেরাগ ছিল যে ক্ষমতার তিন বছরের(১৯৯৯-২০০০ ঘোষিত) মাথায় বাংলাদেশ কে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন? সেই জিয়াউর রহমানের সময় দেশের কৃষি ব্যাবস্হার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সমূহ (ফসলের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্হাপন, চাষাবাদ পদ্ধতি উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি) গ্রহণ করেন। আর এরশাদ সাহেব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চরম সাফল্যের জন্য(বাংলাদেশের মানুষ জন্মের হার ভারত সহ এশিয়ার বহু দেশ হতে অনেক কম প্রায় ১.২%) ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কোর পুরস্কার লাভ করেন এবং কৃষি উৎপাদন ও এর সাথে জড়িত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। যা পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার সরকারের ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। হাসিনা মিথ্যা বলেন যে বিগত খালেদা জিয়ার সরকারের শেষ আর কি ১৯৯৬ পর্যন্ত সময় নাকি খাদ্য ঘাটতি নাকি ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টন যা প্রকৃত পক্ষে ১০-১২ লক্ষ টনের বেশী ছিল না। যারা কৃষি বিষয়ে সত্যিকারের জ্ঞান রাখেন তারা কখনই বলবেন না যে মাত্র তিন বছরে বাংলাদেশের মতন ছোট আয়তনের দেশের(যেখানে প্রতি বছর কৃষিজমি কমছে) পক্ষে ৪০-৫০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি মিটিয়েও আরও ১০-২০ লক্ষ টন খাদ্য বেশী করা কিভাবে সম্ভব অর্থাৎ তিন বছরে ৭০-৮০ লক্ষ টন বেশী ফলন পাওয়া। হয় শেখ হাসিনা মিথ্যুক নতুবা কৃষিবিদদের জ্ঞান মিথ্যা। কারণ সহজেই অনুমেয় আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগের পৃথিবীর কৃষি ব্যাবস্হার চেয়ে বর্তমান ৩-৪ গুণ উন্নত এবং সীমিত জমিতে আধুনিক উন্নয়নশীল কৃষি বা চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করেও তার ফলন দ্বিগুণ করতে না হলেও ১০-১২ বছর লাগে। কারণ গবেষণা অত্যন্ত ধৈর্য্যের বিষয় এবং তদ্বারা কোন কিছুর উদ্ভাবন ও সুফল পাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আর তারপর ৭০-৮০% অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত কৃষকদের কে এক লাফেই উন্নত চাষাবাদ ব্যাবস্হার প্রচলন নিশ্চয়ই এক বছরে সম্ভব নয়। মোট কথা যদি ১৯৯৫-৯৬ সাল ১০-১২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয় তো ৩ বছরে ৩০ লক্ষটন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব(বছরে ২৫-২৬ লক্ষটন উৎপাদন বৃদ্ধি হাসিনার সময় কাগুজে বাঘের মতন মিথ্যা ভাবেই সম্ভব হয়েছিল)। যেমন ত্রিশ বৎসরের পানি চুক্তির ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই আলীগের এডিবি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য বৈদেশিক দাতা সংস্হা হতে সাহায্য বা ঋণ পেতে বিন্দু মাত্র সমস্যা হয় নি। ১৯৯৬-২০০১(১৪ই জুলাই পর্যন্ত) সারা বিশ্বের পরিস্হিতি বর্তমানের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু ৯/১১, আফগান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ তেলের দাম ২৮ ডলার(২০০১-০২ পর্যন্ত) ব্যারেল হতে আজকে ৬৪ ডলারে দাড়িয়েছে তো এহেন পরিস্হিতিতে জনাব সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের অর্থনীতির গাইড করছেন এবং বিভিন্ন প্রবল বৈরী বা বিরূপ চাপ সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিটাকে স্হিতিশীল রেখেছেন সেটাই তো অনেক বেশী। তার উপর হাসিনার আমলের রেখে যাওয়া লো ফরেন কারেন্সির রিজার্ভ, ষড়যন্ত্র কারাসাজির মাধ্যমে শেয়ার বাজার কে মেরুদন্ডহীন করা, ব্যাংকিং সেক্টর কে বিশৃঙ্খল করা ও ব্যাপক ঋণ নিয়ে তারল্য ও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করা, সর্বত্র ব্যাপক দূর্নীতি তথা ২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল কতৃক বিশ্বের সর্বশীর্ষ দূর্নীতি গ্রস্হ দেশের মর্যাদা লাভ কে সামাল দেওয়া কোন ছেলে খেলা বা সহজ ব্যাপার নয়। যদিও জোট সরকার দূর্নীতি মুক্ত নয় তথাপি আলীগের মতন তারা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার্ত দূর্নীতিগ্রস্হ রাক্ষস বা দানব নয়। হাসিনার সরকারের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তো বলেই ফেলেছেন যে মরহুম কিবরিয়া সাহেব নাকি দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা করে ফেলেছেন। তারপরেও যেহেতু জনাব মঞ্জু ভিন্ন দলের বা জাপার খন্ডিত অংশের প্রধান তার কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু হাসিনার আমলের পাট মন্ত্রী জনাব ফয়জুল হকের সাথে অর্থনীতি, রাজনীতি সহ হাসিনার আমলের দূর্নীতি অনিয়ম ও ব্যার্থতা নিয়ে কিবরিয়া সাহেবের সাথে ২০০২ সালে খুব সম্ভবত দৈনিক যুগান্তরে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। স্বয়ং দলীয় নেতা ও সাবেক পূর্ণ মন্ত্রী যেখানে তার দলীয় সরকারের সমালোচনা করেন তো সেখানে আপনি ছগীর সাহেবের মুখে সাইফুর রহমানের সমালোচনা তেমন মানায় না। তবে হ্যা বর্তমান জোট সরকার হাসিনার সরকারের শ্রেষ্ঠ চোরের দেশের মর্যদা রক্ষা করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত বিএনপি সরকারের সিটিসেল(পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোর্শেদ খান) সেল ফোনের মনোপলি ভেঙ্গে (যদিও বিএনপি আমলে অনুমোদিত কিন্তু

নানা অজুহাতে আরকি সিটিসেলের ঘুষের কারণে কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি) গ্রামীণ, এক্টেল(মালিক বিএনপির এমপি), সেবা(বর্তমানে বাংলা লিংক) দের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম তথা জনসাধারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাবহার সুবিধা করে দেন হাসিনার সরকারের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নাসিম। কিন্তু তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে সকল মোবাইল ফোনে বিটিটিবির কল যাবে লোকাল কল হিসেবে বিভাগীয় জোন ভিত্তিক যা কোন প্রকার ইনকামিং চার্জ ছাড়াই এমন কি বিদেশ থেকে কোন আন্তর্জাতিক কল(যা বৈধ ভাবে বিটিটিবির মাধ্যমে আসে) এলেও তাতেও কোন ইনকামিং চার্জ থাকবে না যা তিনি ১৯৯৭ সালে বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৮ সালের শেষ ভাগে বা ১৯৯৯ সালের শুরুতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে চারটি মোবাইল কোম্পানী বিটিটিবির থেকে আগত ইনকামিং কলে ভ্যাট সহ ৩.৪৫ টাকা হারে চার্জ আরোপ করে। কারণ সেল ফোন কোম্পানি গুলি দেখল যে কোন লোক বাসা-অফিস বা বিটিটিবির ল্যান্ড বা পিএসটিএন ফোনের নিকট থাকলে সে আর তার সেলফোন হতে আরেক সেল ফোনে ফোন করে না। আরকি কেউ তার নিজস্ব বা পরিচিত জনের ল্যান্ডফোনের নিকট না থাকলে এমনকি খুব ঠেকায় না পড়লে তার সেলফোন(মোবাইল টু মোবাইল ৬.৯০ টাকা/মিনিট) হতে কোথাও ফোন করে না তাতে তাদের ব্যাপক কল হ্রাস পায় এবং আয় কমে যায়(ঐ সময় বিটিটিবির লোকাল কল ভ্যাট সহ ছিল ১.৯৬ টাকা অসীম সময়ের জন্য যা বর্তমানে ভ্যাট সহ ১.৭৩ টাকা প্রতি ৫ মিনিটের জন্য)। ফলে তারা নাসিম ও আলীগের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের কে ম্যানেজ করে আরকি বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিয়ে অবৈধভাবে বিটিটিবি হতে আগত ইনকামিং কলের ফায়দা তথা ব্যাবহারকারীর গলা কাটার সুযোগ পায় ৪ টি সেল ফোন কোম্পানী এবং রাষ্ট্র হারায় হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব(সরকারী খাত হিসেবে বিটিটিবিই অন্যতম লাভজনাক প্রতিষ্ঠান)। এমন কি পরবর্তীতে বিভিন্ন প্যাকেজ প্রোগ্রামের পোষ্ট পেইড ও প্রিপেইড এ বিটিটিবির ইনকামিং কল এক্সেসের সুবিধা দেওয়া হয়নি যা বর্তমানেও আছে)। এনিয়ে সংসদে ১৯৯৯ সালে নাসিম কে বিএনপির একজন এমপি প্রশ্ন করলে তিনি কোন প্রকার উত্তর দেন নি। ১৯৯৮ সালে দেখা গেল গ্রামীণ ও এক্টেলের যে পরিমাণ কারিগরি কানেক্টিং চ্যানেল ছিল তার ২-৩ গুণ মোবাইল গ্রাহক কে তাদের সার্ভিস দেওয়া শুরু করে ফলে বিটিটিবি থেকে তো বটেই মোবাইল টু মোবাইল কলও ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টা করেও পাওয়া যেতনা। আর ২০০১ সালে হাসিনার সরকারের শেষ কয়েক মাস(৩-৪ মাস) বাদে ৫০, ১০০ ও ১০০+ মাইলের বেশী দূরত্ব ভেদে বিটিটিবির ফোন রেট ছিল মিনিট প্রতি ১১.৫০, ১৭.২৫ ও ২৩ টাকা যেখানে মোবাইল টু মোবাইলে রেট ৬.৯০টাকা/ মিনিট সমগ্র বাংলাদেশ(বস্তুত ১৯৯৭ সালেই ৬টি বিভাগীয় শহড়েই গ্রামীণ ও এক্টেল নেটওয়ার্ক স্হাপিত হয়)। বর্তমানে বিটিটিবির লোকাল জোনের বাইরে এনডব্লিওডির জোন ১০০ ও ১০০+ মাইলের মধ্যে এবং যার রেট প্রতিমিনিট ভ্যাট সহ ৩.৪৫ ও ৫.১৮ টাকা। ১৯৯৭ সাল হতে মোবাইল ফোন ব্যাপক ভাবে আসার পর নাসিমের কারসাজির জন্য বিটিটিবি বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রতিমাসে হারায়। কোন পাগল বা বেকুবও ঠেকায় না পড়লে ১০ টাকার বদলে মিনিটে ২৩ টাকা খরচ করে চট্টগ্রাম বা দিনাজপুর ফোন করবে? বর্তমান সরকার মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য বিটিটিবির ফোন সংযোগ ১০১০০ টাকা যা জেলা শহড় ৮১০০ টাকা এবং উপজেলা ও গ্রামের(যেখানে লাইন আছে) জন্য ৬১০০ টাকা নির্ধারণ করে। যদিও ডিমান্ড নোট পাওয়াটা ঘুষ ও চ্যানেল ছাড়া হয় না। আর নাসিম সাহেব সেই ১৯৯৮ সাল থেকেই বলে আসছিলেন সরকারী তথা বিটিটিবির মোবাইল ছাড়বেন। আসল ব্যাপার হল আমগাছে যখন আম ভরা থাকে তখন যেমন ঝাকি দিলে ঝড় ঝড় করে আম ঝড়ে ঠিক তেমনি তিনি সরকারী মোবাইলের ফাঁপড় দিয়ে চারটি সেল ফোন কোম্পানী হতে শত শত কোটি টাকা উৎকোচ নেন। তবুও তো জোট সরকার এ পর্যন্ত লাখ দেড়েক টেলিটক সেল ফোন বাজারে ছেড়েছে। গত বছরই টেলিটক লাখ তিনেক ছাড়ার কথা যা এ বছরে ১০ লাখের অধিক টার্গেট করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ ও সিটিসেলের কারসাজিতে জোট সরকারের প্রভাবশালী অংশ ঘুষ নিয়ে ব্যাপারটিকে অনেক বিলম্বিত করে। কিন্তু ধন্যবাদ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমিনুল হক সাহেব কে যার আন্তরিকতায় আজকে টেলিটকের সংখ্যা ১ লাখের উপর। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ ও বৃহৎ সেল ফোন নেটওয়ার্ক গ্রামীণ টেলি টককে তার নেটওয়ার্ক কে ইন-আউট গোয়িং সুবিধা দিচেছ না

যদিও তারা বিটিআরসি'র সাথে আন্তঃসংযোগের চুক্তি করেছে। তো ছগীর সাহবের কথা তর্কের খাতিরে মেনে নিলে দেখা যায় যে জোট সরকার আলীগের চেয়ে বেশী দূর্নীতিবাজ হয়েও সরকারী সেল ফোনের ভিত্তি স্হাপন করেছে। যেখানে বর্তমানে ১ লাখের জায়গায় ৫-৭ লাখ হওয়ার কথা ও বাকি চারটি বেসরকারী সেল ফোন কোম্পানীর সাথে নিয়মিত ভাবে কোন প্রকার জ্যাম ছাড়া মোবাইল টু মোবাইল যোগাযোগ হওয়ার কথা সেখানে না হয় বিএনপি ঘুষ খায় কিন্তু আলীগ কেন এ বিষয়ে কোন কিছু বলছে না? কারণ একটাই যে নাসিম সাহেব যে নিমক খেয়েছেন তাতে আলীগের অন্য কেউ জোট সরকারের সমালোচনা করলে তো প্রকৃতপক্ষে নিমক হারামী বা বেঈমানী হবে। ১৯৯৬ হতে ৯৮ মাঝামাঝি পর্যন্ত আলীগের সময় মোটামুটি ভাল ছিল আর কি মেজর (অবঃ) রফিক সাহেব যতদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যেই নাসিম টেলিযোগাযোগের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন সাথে সাথে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্হিতি ভেঙ্গে যায়। সারা বাংলাদেশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঢাকা শহড়েই প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ জন খুন হত। তখন ঢাকা-১০(রমনা-তেজগাও) আসন এলাকার এমপি ইকবালের ব্যাকিং এ চলত ফাইভ ষ্টার সন্ত্রাসী গ্রূপ যাতে বর্তমানে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী আরমান-লিয়াকত ছিল। অন্যদিকে বলা হয়(আলীগ বলত এখনও বলে) ফাইভ ষ্টার গ্রূপের এন্টি গ্রূপ সুব্রত বাইনের নেতৃত্বাধীন(জিসানও জড়িত) সেভেনষ্টার নাকি বিএনপির ব্যাকিং এ চলে। ভাঁড়ামু আর কাকে বলে? ফাইভ ও সেভেনের মধ্যে রমনা মগবাজার এলাকায় প্রচুর সশস্ত্র সংঘর্ষ হত। তো সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কি জানত না কই সেভেন বাহিনী আছে বা তাদের কার্যক্রম সমন্ধে ধারণা পেত না? আর বিএনপির সন্ত্রাসী গ্রূপের দাপটে আলীগের সন্ত্রাসী গ্রূপ সুবিধা করতে পারবে না যখন কিনা হাসিনার আলীগ সরকার ক্ষমতায়? আসল সত্য হল সুব্রত বাইন সহ সেভেন ষ্টার গ্রূপ কে নাসিম ও আমির হোসেন আমু সহ আলীগের হোমড়া চোমড়ারা শেল্টার দিত। জোট সরকার ক্ষমতায় এলে ফাইভ ও সেভেনের প্রধান প্রধান সন্ত্রাসীরা ভারতের কোলকাতায় ভাগে এবং মাঝে মাঝে ভিন্ন লোকের ছদ্দবেশ ধরে দেশে বিশেষ করে ঢাকায় এসে অপকর্ম করে চলে যায়। শোনা যায় কোলকাতায় এরা "র" এর কল্যাণে জামাই আদরে আছে। আর ৮/২১ এর ঘটনায় ভিডিও ফুটেজে প্রমাণিত যে সেভেন গ্রূপ ও মকুল গ্রেনেড হামলায় জড়িত অথচ তারা ভারতীয় "র" এর শেল্টারে আছে এর প্রকৃত গোমড় টা কি? বর্তমানে র‍্যাব গঠনের পর ঢাকা শহড় তো দুর সারা বাংলাদেশে একদিনে ১২ জনও খুন হয় না। পাষান্ড বর্বর খুনী জুলুমবাজ সন্ত্রাসীদের কে র‍্যাব বা পুলিশ হত্যা করলে মানবাধিকার গেল গেল বলে চেচামেচি করে যেখানে সন্ত্রাসীদের হাতে লাখ লাখ ও কোটি কোটি মানুষ তথা পুরো বাংলাদেশের মানুষ জিম্মি(হত্যা, গুম-অপহরণ, জখম অঙ্গহানি করা, চাঁদাবাজি, ছিনতাই-ডাকাতি নির্যাতন করা) তখন এদের বিরূদ্ধে আলীগ ও জোট সরকার বিরোধীরা টু শব্দটিও করে না। যেখানে বিবেকবান আলীগের সমর্থকরা পর্যন্ত র‍্যাবের কার্যক্রমে সন্তষ্ট সেখানে দেশে যাতে সন্ত্রাস-আতঙ্ক অরাজকতা অব্যাহত থাকে সে জন্য শেখ হাসিনা জোট সরকারের কঠোর পদক্ষেপের তীব্র নিন্দায় বিভোর। দেশে অরাজকতা চললে জোট সরকার বদনামী হবে এবং ক্ষতি নিশ্চিত যেখানে আলীগ দারূণ লাভবান হবে। সে জন্য দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত কঠোর হস্তে অপরাধ দমন ও দোষীদের গ্রেফতার শাস্তি ও প্রয়োজন বোধে দাগী অপরাধীকে হত্যা করা। তবেই ভারতীয় তাবেদার আলীগের ষড়যন্ত্র ব্যার্থ হবে। এটা আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারদের জন্য যতই নির্মম হৌক আসলে তা সত্য। আজকে যখন লেখা শেষ করছি তখন বাংলাদেশের ৫০ টি বা তার বেশী জেলায় তথা কথিত ইসলামী চরমপন্হী গ্রূপের বোমা হামলায় একজন নিহত ও অনেক আহত হয়েছে এবং দেশে আতঙ্কজনক পরিস্হিতি সৃষ্টি করা হচেছ। আসলে এ সব ইসলামী গ্রূপের মুখোশে ভারতীয় "র" এর কারসাজি। উদ্দেশ্য একটাই যেভাবেই হৌক নভেম্বরের সার্ক সম্মেলন বানচাল করা। কারণ ঐ নাসিমই বলেছিলেন যে এই জোট সরকারের আমলে কোনদিন সার্ক সম্মেলন হবে না। এটা তারই মহড়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের বোমা হামলার জায়গায় গ্রেনেড বা আরডিএক্স বোমা হামলা হবে কিনা তা বলা যাচেছ না। আর ভবিষ্যতে যারা নাকি ৪০% সমর্থনের জোড়ে আওয়ামিলীগাররা ৬০% এর সমর্থিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিকে তথাকথিত তত্ত্ববধায়ক সরকারের উদ্ভট সংস্কারের দ্বাবীতে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর

অপচেষ্টায় লিপ্ত। কারণ আলীগ জানে জাপা তাদের সাথে জোট গঠন না করলে জিন্দেগীতে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর ২০০৬-০৭ সালে ক্ষমতায় না আসতে পারলে আলীগের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাংলাদেশ থেকে চিরতরে খতম। কারণ বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইসলাম বিদ্বেষী ও পৌত্তলিক সংস্কৃতি এবং সমাজতন্ত্র অচল থিউরি। জাতিসংঘের মতে বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ নয় এবং ইকোনোমিষ্টের মতে বাংলাদেশের সিংহভাগ লোক(মুসলমান) ধর্মীয় গুরুত্ব দেয় বেশী ও ভারত বিরোধী। কাজেই সারা দেশে ১৭ই আগষ্টের মত পরিকল্পিত নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ কে মৌলবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নত করে দেশ কে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে চিরদিন পঙ্গু করা। কাজেই এখন থেকেই এ সকল ষড়যন্ত্র কারী নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে কঠোরতর এবং নির্মম হতে হবে। নতুবা এদেশ কে চিরতরে ভারতের তাবেদারী করতে হবে তথা গোলামীর জিঞ্জির পরতে হবে। এরচেয়ে বেশী নির্মম সত্য বাংলাদেশের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। কারণ একটি দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর দেশ প্রেম ও তার স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ।

সবাইকে ধন্যবাদ,

মোঃ মোস্তফা কামাল,
ঢাকা, ১৭-৮-২০০৫ ইং।